বিষয়বস্তুঃ রমাযানের পূর্বে নফসের নিয়ন্ত্রণ

শা’বান মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৯ শা’বান ১৪৪৫ হিজরী, ১ মার্চ ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩৪

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۞وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার বন্ধুগণ ! আজ ১৪৪৫ হিজরীর শা’বান মাসের ১৯ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, রমাযানের পূর্বে নফসের নিয়ন্ত্রণ।

আমরা জানি, গত ৪ দিন পূর্বে শবে বারাআত রজনী পার হয়ে গেছে। আর মাত্র ১১ দিন পর পবিত্র রমাযান মাস আসতে চলেছে। অনুরূপভাবে আমরা এটাও জানি যে, এই শা’বান মাসটি হল, পবিত্র রমাযান মাসের প্রস্তুতির মাস। যাতে করে আসন্ন রমাযান মাসে আমরা বেশি বেশি রহমত, বরকত লুপে নিতে পারি।

সম্মানিত উপস্থিতি ! আপনারা পবিত্র রমাযানের প্রস্তুতির জন্য নফল নামায, নফল রোযা ও অন্যান্য নফল ইবাদতের কথা শুনেছেন। কিন্তু আজ আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যে বিষয়টি সকল ইবাদতের মূল। সেটা হল, নফসের নিয়ন্ত্রণ।

নফস মানে আত্মা বা মন। এই নফসের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষের জীবনটা হবে পশুদের সমতুল্ল। পশুরা যেমন স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতার জীবন যাপন করে, তদ্রূপ নফসের প্রতি নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ পশুদের মত স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার হয়ে উঠবে। ফলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

মনে রাখা দরকার, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে সংযত হয়ে চলে, সে উভয়জগতে সফলতা অর্জন করতে পারবে। কুরআন করীমের ৩০তম পারায় একটি সূরা আছে। সূরাটির নাম, সূরায়ে শাম্‌স। একটি চমৎকার বিষয় লক্ষ্য করুনঃ এই সূরার মধ্যে মোট ১৫টি আয়াত আছে। যার মধ্যে প্রথম ৮টি আয়াতে আল্লাহ সুব্‌হানাহু তায়ালা পরস্পর ১১টি জিনিসের কসম খেয়েছেন।

কসম কী জন্যে খাওয়া হয় জানেন ? কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কসম খাওয়া হয়। যেমন আমরা কখনও কখনও এভাবে কসম খাই যে, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছিঃ আমি এ কাজটি করেছি, কিংবা করিনি।

এখানে একটি মাসআলা জেনে রাখা উচিৎ, সেটা হল কোন বান্দার জন্য আল্লাহর সত্ত্বাগত নাম কিংবা আল্লাহর গুনবাচক নাম ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির নামে কসম খাওয়া জাইয নয়। অনেকে বাপ-দাদাদের নামে কসম খায়। আবার অনেকে নিজের সন্তানের নামে কসম খায়। অথবা পীর ওলী-আউলিয়াদের নামে কসম খায়। অথচ বান্দার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে কসম খাওয়া হারাম। কেননা কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কসম খেতে হলে

সবচেয়ে মহান সত্ত্বার কসম খেতে হবে তবেই গুরুত্ব হবে। আর কোন বান্দার কাছে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্ত্বা মহান নয়। সেজন্য বান্দার জন্য আল্লাহ ছাড়া কারোর নামে কসম খাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ।

সহীহ বুখারীর ৩৮৩৬ নম্বর হাদীসে ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ اِلَّا بِاللهِ "শুনে রেখো, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোন নামে কসম না খায়। কুরাইশ বংশের লোকেরা নিজেদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেত। নবীজি তাদেরকে বললেনঃ لَا تَحْلِفُوْا بِأَبَائِكُمْ "তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেয়ো না।" যদি একান্ত কসম খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহর নামে কসম খাও।"

এ হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় বোঝা গেল। (১) কসম খাওয়া কোন মুস্তাহাব আমল নয়। তবে প্রয়োজনে কসম খাওয়া শুধুমাত্র জাইয। (২) কোন বান্দার জন্য আল্লাহর নিজস্ব নাম অথবা আল্লাহর সিফাতী নাম ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির নামে কসম খাওয়া জাইয নেই।

তবে মহান রব্বুল আলামীন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য নিজে স্রষ্টা হয়ে বিভিন্ন সৃষ্টির নামে কসম খেয়েছেন। যেমন এই সূরা শামসের মধ্যে পরস্পর ১১টি সৃষ্টির নামে কসম খেয়েছেন। অতঃপর নফসের শুদ্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমার জানা মতে নফসের শুদ্ধিকরণ

ছাড়া অন্য এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা একসঙ্গে ১১টি জিনিসের কসম খেয়েছেন।

এবার আমরা সূরা শামসের তরজমা লক্ষ্য করিঃ প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ وَالْشَّمْسِ وَضُحٰهَا "সূর্যের কসম এবং তার কিরণের কসম।" দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেনঃ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا "চন্দ্রের কসম যখন সে সূর্যের পিছনে আসে।" তৃতীয় আয়াতে বলেছেনঃ وَالْنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا "দিবালোকের কসম যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে উজ্জ্বল করে।" চতুর্থ আয়াতে বলেছেনঃ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا "রাতের কসম যখন সে সূর্যকে ঢেকে দেয়।" পঞ্চম আয়াতে বলেছেনঃ وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا আকাশের কসম এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তার কসম।"

ষষ্ঠ আয়াতে বলেছেনঃ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا "পৃথিবীর কসম এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার কসম।" সপ্তম আয়াতে বলেছেনঃ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا "নফস অর্থাৎ প্রাণের কসম এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তার কসম।" অষ্টম আয়াতে বলেছেনঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا "অতঃপর সেই নফসকে ভালো মন্দ উভয়ের জ্ঞান দান করেছেন।"

এপর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ১১ টি জিনিসের কসম খেয়েছেন। এই ১১টি জিনিসের কসম খাওয়ার পর অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে কী বলেছেন দেখুন।

৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا "নিশচয় সেই ব্যক্তি সফলকাম যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে নিল।" এরপরের আয়াতে বলেছেনঃ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا "আর নিশ্চয় ব্যর্থ ও বিফল সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসকে কলুষিত করল।"

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, সমস্ত আমলের মূল হল, নফসকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শুদ্ধ করা। যে ব্যক্তি নফসকে শুদ্ধ করে নিল, সে উভয়জগতে কামিয়াব। সেজন্য পবিত্র রমাযান মাস আগমনের পূর্বে একজন ঈমানদারের প্রধান কর্তব্য হল, নিজের নফসের উত্তেজনাকে দমন করে আল্লাহর জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া।

সম্মানিত বন্ধুগণ ! এখন প্রশ্ন হল, নফসকে দমন করার উপায় কী ? মনে রাখবেন, অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামগণ নফসকে দমন করার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করেছেন। তবে তার মধ্যে সর্বোত্তম উপায় হল, দেহ এবং রূহের খোরাক অর্থাৎ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের দেহ ও রূহের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে করতে পারবে না।

এবার আমাদের জানার বিষয় হল, দেহ এবং রূহের খাদ্য কোনগুলি ? প্রথমেই আমাদের জেনে রাখা দরকার, মানুষ দু'টি জিনিস দ্বারা গঠিত। একটি হল, দেহ। আর আরেকটি হল, তার রূহ বা আত্মা। দেহ মাটি এবং মাটির উপকরণ দ্বারা তৈরি। হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম সরাসরি মাটি দিয়ে তৈরি, আর তাদের সন্তান আমরা মাটির উপকরণ দিয়ে তৈরি। মাটির উপকরণ বলতে, আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন যে সমস্ত শস্য ও শাক-সব্জি খাই,

তা থেকে আমাদের শরীরে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি হয়। আর সেই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংমিশ্রণে আমরা তৈরি। আর আমাদের রূহ আল্লাহর পক্ষ হতে আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। রূহ মাটি থেকে তৈরি নয়।

এরপর জানা দরকার যে, এই দেহ ও আত্মা উভয়ের খাদ্য কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু দেহ মাটি ও মাটির উপাদান থেকে তৈরি, সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন দেহের খাদ্য মাটির মধ্য থেকেই রেখেছেন। অর্থাৎ শাক-সব্জি, ফল-ফুরুট ও খাদ্যশস্য। যেটা আমাদেরকে মাটি থেকেই উৎপাদন করে নিতে হয়। আর রূহ যেহেতু আসমান থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, সেজন্য রূহের খাদ্য তিনি আসমান থেকেই নাযিল করেছেন। রূহের সেই খাদ্য হল, আসমানী ওহীর মাধ্যমে পাঠানো নেক আমল।

আরেকটি কথা মনে রাখা উচিৎ, দেহের খাদ্য অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি শেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীদেরকে পৃথিবীতে পাঠান নি। বরং জীবিকা উপার্জনের উপায় তো তিনি সমস্ত সৃষ্টির মস্তিষ্কে সৃষ্টিগতভাবে ইল্‌হাম করে দিয়েছেন। ইলহাম শব্দের অর্থ হল, অন্তরে অবগত করানো। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল সৃষ্টিকে তাদের জীবিকা অর্জনের জ্ঞান সৃষ্টিগত ভাবে তাদের অন্তর বা মস্তিষ্কে দিয়ে রেখেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, মুরগির ছানাগুলো ডিম ফুটে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে দানা খুঁটে খুঁটে খায়। এদেরকে এভাবে দানা খুঁটে খাওয়া কে শিখিয়েছে ?

অনুরূপভাবে আমরা বর্তমান ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইলের ইউটিউবে পৃথিবীর বিভিন্ন জঙ্গলের প্রাণীদের জীবিকা অর্জনের ভিডিওগুলি দেখতে পাই।

শিয়ালের শিকার ধরার কৌশল।

যেমন একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি শিয়াল জীবিকার সন্ধানে একটি নদীর ধারে আসল। নদীর ধারে কাঁকড়ারা ঘুরে বেড়ায়। শিয়াল সেই কাঁকড়াগুলি ধরে খায়। এভাবে সে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু দেখা গেল কাঁকড়ারাও খুব চালাক, যখনই শিয়াল নদীর ধারে আসে তখনই নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য চালা বা ছিদ্রের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এভাবে তারা বেঁচে যায়।

কিন্তু আমরা জানি, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শিয়াল সবচেয়ে বেশি ধূর্তবাজ ও চালাক। তাই শিয়ালকে বলা হয় পণ্ডিত মশাই। এবার শিয়াল সেই কাঁকড়া শিকার করার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করল দেখুন। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, শিয়াল নিজের লেজটি চালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। যেই চালার মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে দিল, তখন কাঁকড়া শিয়ালের লেজে কামড় দিল। আর যেই কাঁকড়া লেজে কামড় দিল, সেই ঝট করে শিয়াল ঝট করে লেজ বাইরে টেনে নিল। কাঁকড়া যেহেতু লেজে কামড় দিয়ে ধরেছিল, তাই কাঁকড়াও বাইরে চলে আসল। সঙ্গে সঙ্গে শিয়াল ঘপ করে ধরে খেয়ে নিল।

এবার বলুনঃ শিয়াল জীবিকা অর্জনের এপদ্ধতি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখেছে ? অতএব, একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, দেহের খাদ্য অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি শেখানোর

জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোন নবী পাঠান নি। তবে রূহের খাদ্য আসমানী ওহীর জ্ঞান শেখানোর জন্য অর্থাৎ আদর্শ ও নীতিশিক্ষা প্রদানের জন্য এবং মানুষকে প্রকৃত আদর্শমানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ যুগে যুগে এক লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কিরাম পাঠিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই গুরুত্ব সহকারে সেই দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

মুহতারম হাযিরীন ! এবার আমরা মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি। আমরা ইতিপূর্বে জানতে পারলাম যে, দেহ এবং রূহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু তাদের সেই খাদ্য যোগান দেওয়ায় যদি স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে তার পরিণাম খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

যেমন দেহের খাদ্য সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারব। যে সমস্ত খাদ্যগুলি দেহকে সুস্থ রাখার জন্য যে সময়ে যতটা প্রয়োজন, তখন সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিৎ। আর যেগুলি দেহের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলি বর্জন করা উচিৎ। কিন্তু এখন যদি দেহের খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করি, অর্থাৎ ভাল-মন্দ বাছাই না করে যখন যা মন চায় তাই গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যেমন বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ সুগার, কোলেস্টেরল ও প্রেসারের রোগী। এখন প্রশ্ন হল, এসমস্ত রোগগুলি শরীরে কীভাবে পয়দা হল ? আর এমন রোগীদের জন্য কেমন ধরণের খাদ্য গ্রহণ

করা উচিৎ ? মনে রাখবেন, এগুলি দেহের খাদ্য গ্রহণে অসাবধানতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ঘটে থাকে। আর এমন রোগীদের জন্য চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন করে শাক-সব্জি বেশি বেশি গ্রহণ করা উচিৎ।

এটা তো হল, দেহের খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়। এবার আমরা রূহের খাদ্য সম্পর্কে জানব। রূহের খাদ্য হল, আসমানী ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত নেক আমলসমূহ। যত নেক আমল করতে থাকবেন, তত রূহ তরতাজা থাকবে। আর রূহের জন্য ক্ষতিকর বস্তু হল, বদ আমল ও পাপ সমূহ। বান্দা যত পাপ করবে, তত রূহ কলুষিত হবে। ফলে আস্তে আস্তে রূহ একসময় মরে যাবে। তখন নেক আমলের প্রতি আর মন লাগবে না। এটা বাস্তব পরীক্ষিত বিষয়। অতএব আমাদেরকে সর্বদা রূহের শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

সুধী বন্ধুগণ ! এখন প্রশ্ন হল, রূহ বা আত্মার শত্রু কয়টি ? জেনে রাখা দরকার, জগত বিখ্যাত দার্শনিক ও মহাপণ্ডিত ইমাম গাযালী (রহ) ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবের ৩ খণ্ডের ৬৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, أَعْدَاءُ الْاِنْسَانِ ثَلَاثَةٌ "মানুষের (রূহের) শত্রু ৩টি জিনিস। (১) دُنْيَاهُ তার দুনিয়া অর্থাৎ তার ধন-সম্পদ, (২) شَيْطَانُهُ তার শয়তান অর্থাৎ ইবলিস ও তার চেলা-চামটা, (৩) نَفْسُهُ তার নিজের নফস।

অতঃপর তিনি এই ৩টি শত্রু থেকে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। বললেনঃ তুমি দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক তার মোহ ত্যাগ করে। অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া লোভ-লালসা বশত অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা

থেকে বিরত থাক। তাহলে দুনিয়া নামক শত্রু থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

আর তোমার দ্বিতীয় শত্রু শয়তান থেকে বাঁচ তার বিরোধিতা করে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে যত প্রকার গোনাহের কথা উল্লেখ আছে সবগুলি শয়তানের রাস্তা। ওই গোনাহগুলির বিরুদ্ধচারন কর, তাহলে শয়তান থেকে বাঁচতে পারবে।

অনুরূপভাবে তোমার তৃতীয় শত্রু হল, নিজের নফস। আর সেই নফস থেকে বেঁচে থাক মনের খাহেশাত অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন করে। অর্থাৎ হারাম, হালাল না বেছে লাগামহীন চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া কিংবা অনর্থক কাজকর্ম ও বেফাস কথাবার্তা ত্যাগ করে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ কর। যদি সর্বদা নফসের খাহেশাতকে অনুসরণ করে চলা হয়, তাহলে নফস নামক শত্রু থেকে রূহকে বাঁচান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

মুহতারম ভাই সকল ! পরিশেষে আবার একবার স্মরণ করে দিই যে, পবিত্র রমাযান মাস আসার পূর্বে আমরা যদি নিজেদের নফসকে একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে অতিসহজে আমরা পবিত্র রমাযান মাসে আল্লাহর রহমত ও বরকত বেশি বেশি অর্জন করতে সক্ষম হব, ইন-শা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।